স্বাধীনতা যুদ্ধে যে গানগুলো শক্তি যুগিয়েছে

অলকানন্দা মালা

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

কালে কালে যতবার মানুষ দাবি আদায়ের মিছিলে জেগে উঠেছে ততবারই জ্বালানির যোগান দিয়েছে সংগীত। বাংলাদেশেও একই চিত্র। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে সংগীতের অবদান অনস্বীকার্য। রণাঙ্গনের ক্লান্ত যোদ্ধা যখন ছাউনিতে ফিরেছে তখন দেশাত্মবোধক গান তাকে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে প্রবাল বিক্রমে ফের শত্রুর বুকে চড়াও হতে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় কলকাতায় গড়ে উঠেছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। যেখান থেকে বিভিন্ন সংস্কৃতে কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিকামী মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হতো অনুপ্রাণিত করা হতো। ওই সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এমন কিছু গান তৈরি হয়েছিল যা কাজ করেছে মেশিনগানের মতো। দেখতে দেখতে দেশের বয়স পঞ্চাশের বেশি হয়ে গেলেও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে থেকে তৈরি গানগুলো আজও অমলিন। ওই সময়ের তিনটি গান আজকের আলোচনার বিষয়। এগুলো হচ্ছে তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাব বলে যুদ্ধ করি, রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি।

তীরহারা ওই ঢেউয়ের সাগর পাড়ি দেব রে

গানটির কথা ও সুর সংগীতশিল্পী আপেল মাহমুদের। তার সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছিলেন রথীন্দ্রনাথ রায়। ওই কারণে গানটি রথীন্দ্রনাথ রায়েরও গল্প। দেশ ছেড়ে কণ্ঠশিল্পীরা পাড়ি জমিয়েছেন ওপারে। ঠাঁই নিয়েছেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। রথীন্দ্রনাথ রায়ের গন্তব্যও ছিল শিল্পীদের ওই শিবির। কিন্তু কলকাতায় গিয়ে খুঁজে পাচ্ছিলেন না বাংলাদেশের শিল্পীদের মিলনস্থল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। একে তো নতুন তার ওপর রাস্তাঘাট সবই অপরিচিত। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র খুঁজে পেতে এর ওর কাছে জিজ্ঞেস করছিলেন রথীন্দ্রনাথ রায়। কিন্তু খুঁজে পাওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। অতঃপর খুঁজে খুঁজে আসেন বালিগঞ্জের ৫৭/৮ এর বাড়িতে। কড়া পাহারায় ছিল দোতলা বাড়িটি। ঢোকাও সহজসাধ্য ছিল না।

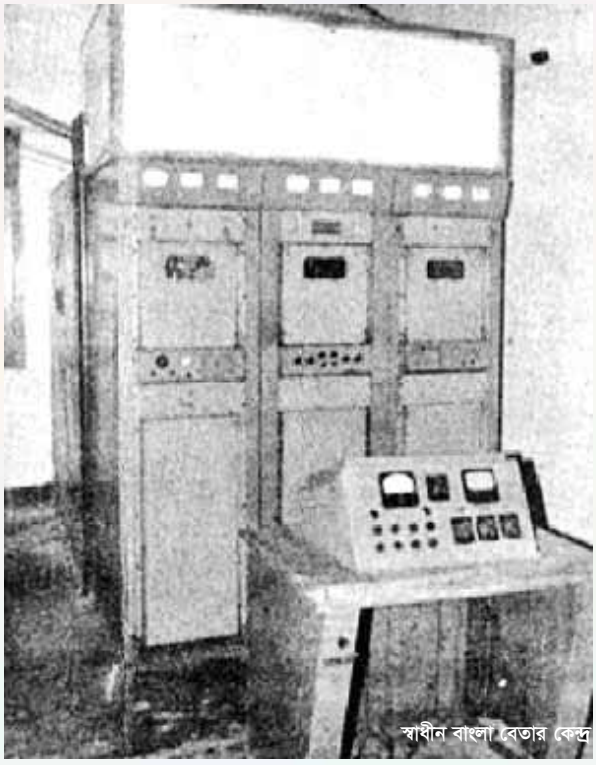
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

১৯৭১ সালের জুন মাস। ১৩ বা ১৪ তারিখ হবে। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে রথীন্দ্রনাথ পৌঁছে যান ওই বাড়িটিতে। ঢুকতেই দেখা মেলে প্রাণের মানুষগুলোর। কামাল লোহানী, আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদসহ সবাই আছেন সেখানে। দরাজ কণ্ঠের রথীন্দ্রনাথকে দেখেই হই হই করে ওঠেন সবাই। কণ্ঠে প্রাণের মানুষের সঙ্গে মিলনের আনন্দ। সবাই বলে উঠলেন, এই যে আইসা গেছে, আইসা গেছে। আর চিন্তা নাই। রথীন্দ্রনাথ রায়ের মনে হলো বাংলাদেশের সংগীতাঙ্গন যেন তুলে নিয়ে বসানো হয়েছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে। চিরচেনা মানুষদের কাছে পেয়ে অচেনা শহরে ফেললেন স্বস্তির নিশ্বাস। আব্দুল জব্বার বুঝতে পারলেন বহু ক্রোশ ভেঙে এসেছেন রথীন্দ্রনাথ। ক্লান্ত শরীরে বিশ্রামের প্রয়োজন। তিনি বললেন, 'আব্বা, তুমি বিশ্রাম নাও। সন্ধ্যায় তোমার সঙ্গে দেখা হবে।' কামাল লোহানী বললেন, 'এখানে খাওয়া-দাওয়া সব ফ্রি। মাসে হাত খরচ বাবদ ৫০ টাকা পাবি।' এতে কোনো আপত্তি ছিল না রথীন্দ্রনাথ রায়ের। তিনি যে প্রাণের জায়গায় পৌঁছতে পেরেছেন সেটিই ছিল স্বস্তির। আব্দুল জব্বারের কথা মতো বিশ্রাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে দুপুরে বিছানায় গা এলিয়ে দেন। ক্লান্ত শরীর আরাম পেতেই দু চোখ লেগে আসে। মুহূর্তেই ঘুমে তলিয়ে যান। এক ঘুমে সন্ধ্যা। ঠিক ওই মুহূর্তে আপেল মাহমুদ এসে ডাকাডাকি শুরু করেন। মামু সম্বোধন করতেন রথীন্দ্রনাথ রায় কে। হঠাৎ 'এই মামু ওঠো' শব্দ শুনে চমকে ওঠেন রথীন্দ্রনাথ রায়।

তিনি যে কলকাতায় নিরাপদে আছেন বিষয়টি ভুলে যান। পাক হায়নাদের আতঙ্ক তখনও কাটেনি তার। ঘুম জড়ানো চোখে ভাবতে থাকেন তিনি যুদ্ধাক্রান্ত বাংলাদেশেই আছেন। আত্মারাম খাচাছাড়া হয়ে যায়। ধড়ফড় করে উঠে বলেন, কেন মিলিটারি আসছে নাকি? তার ভুল ভাঙান আপেল মাহমুদ। বলেন, 'এখানে মিলিটারি আসবে কোথা থেকে। তুই হাত মুখ ধুয়ে একটু ওপরে আয়। আমি একটা গানে সুর

করেছি। তোকে একটু টান দিয়ে দিতে হবে।' রথীন্দ্রনাথ রায় আর দেরি করেন না। হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে সোজা দোতলায় চলে যান। প্রথম দিনই গানটি কণ্ঠে তুলে ফেলেন তিনি। সেসময় গানটি ভীষণভাবে নাড়া দেয় বাঙালিকে। কলকাতায় ফেলে সাড়া। আজও স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের গানের কথা উঠলে গানটি সামনে চলে আসে।

মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের এই গানটি তৈরি হয় ১৯৭১ সালের জুন মাসে। গানটির গীতিকার গোবিন্দ হালদার। সুর ও কণ্ঠ আপেল মাহমুদের। ওই সময়টায় বাংলাদেশের সংগীত আঙ্গনের শিল্পীদের ঠিকানা কলকাতার বালিগঞ্জে দোতলা বাড়িতে অবস্থিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। হায়েনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত দেশের বীর যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাতে নতুন নতুন গান তৈরি করাই ছিল তাদের একমাত্র কাজ। ঘরবাড়ি, ঠিকানা দিনরাত হয়ে উঠেছিল ওই বেতার কেন্দ্র। সেখানেই নাওয়া খাওয়া ঘুম আর কণ্ঠে গান তোলা। গানটির গীতিকার গোবিন্দ হালদারের নাম দেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অদ্ভুতভাবে।

গোবিন্দ হালদার কলকাতার আয়কর বিভাগে চাকরি করতেন পাশাপাশি লিখতেন গান ও কবিতা। বন্ধু কামাল আহমেদের অনুপ্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধের গান লেখা শুরু করেন তিনি। এ সময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কর্ণধার ছিলেন কামাল লোহানী। তার সঙ্গে কামাল আহমেদই পরিচয় করিয়ে দেন গোবিন্দ হালদারকে। ওই সময় নিজের লেখা ১৫ টি গানের একটি খাতা কামাল লোহানীকে তুলে দেন এই গীতিকার। গোবিন্দ হালদারের গীতিকবিতার খাতাটি হাতে পড়ে আপেল মাহমুদের। গানগুলোতে চোখ বুলিয়ে তাজ্জব বলে যান শিল্পী। কথাগুলোকে যত না তার গান মনে হয়েছিল তার চেয়ে বেশি মনে হয়েছিল বারুদ। আরও অবাক হয়েছিলেন গোবিন্দ হালদারের মতো সাদাসিধে মানুষের ভেতর থেকে এই কথাগুলো বের হয়েছে দেখে। গানের খাতা হাতে পড়ার দিনই গীতিকবির সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় আপেল মাহমুদের। কথোপকথনও হয় তাদের। আপেল মাহমুদ জানতে পারেন অনেক আগে থেকেই লেখালেখির সঙ্গে সম্পর্ক তার। সবগুলো গানই আলাদাভাবে আলোড়িত করে আপেল মাহমুদকে। গানের কথায় বিশ্ব শান্তি, নারী, ফুল, মাটি আর মানুষের কথার চমৎকার উপস্থাপন দেখে নড়েচড়ে বসেন তিনি। সবচেয়ে মনে ধরে মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি গানটি। ফলে আর সময় নেননি। তৎক্ষণাৎ সুর বসান তাতে। সে অভিজ্ঞতাও বিচিত্র ছিল গায়কের। কথাগুলোতে সুর করতে গিয়ে ঘোরে চলে গিয়েছিলেন তিনি। রেকর্ড করতেও দেরি করেননি আপেল মাহমুদ।

জুন মাসেই কণ্ঠ তোলেন। মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়েছিল গানটি। সম্মুখ সমরে ব্যস্ত যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যোগাতেও কাজ

করেছে ওষুধের মত। সেইসঙ্গে আপেল মাহমুদের ক্যারিয়ারকেও করে তুলেছিল উজ্জ্বল। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে ৫ দশকের উপরে। গানটি আজও সেদিনের সেই আবেদন ধরে রেখেছে। এখনও দেশ সংকটে পড়লে দেশপ্রেমিক জনতা এই গান শুনে উদ্দীপনা বাড়ায়। নতুন করে দেশের হয়ে কথা বলতে পায় সাহস।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ

রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নতুন যাত্রা শুরু হয়েছিল বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন থেকে। দিনটি ছিল ২৫ মে। তখন তো শুরু থেকেই সঙ্গে ছিলেন সুরকার সুজেয় শ্যাম। বেতার কেন্দ্রে অবস্থানরত সবাই জানতেন আর বসে থাকার সময় নেই। কাজ শুরু করে দিতে হবে। শুরু হয় একের পর এক দেশাত্মবোধক গান তৈরির। সুজেয় শ্যামও বসে ছিলেন না। লেগে পড়েছিলেন গান তৈরিতে। জুন মাসের ৮ তারিখের ঘটনা। সেদিন দোতলার স্টুডিওতে কাজ শেষে নামছিলেন এ সঙ্গীতজ্ঞ। সিঁড়িতে দেখা হয় আবুল কাশেম সন্দ্বীপের সঙ্গে। সন্দ্বীপ ছিলেন একজন গীতিকবি। খুব করে চাইতেন মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ প্রদানের গানের তালিকায় তার নামটি থেকে যাক। কিন্তু নিজের লেখা গানের কথাগুলো সুরকার সমর দাসকে দেখানোর মতো সাহস ছিল না তার। তাই নিজের লেখা গান সুজেয় শ্যাম কেই হস্তান্তর করেন তিনি। বলেন, 'সমরদাকে দেখানোর সাহস হয়নি, আপনার হাতে তুলে দিলাম। দেখুন, গানটা করা যায় কিনা।' রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি, গানটি পড়েই মুগ্ধ হয়ে যান সুজেয়। এতটাই ভালো লাগে যে সুর করতে সময় নেননি। দুদিনের মধ্যে সুরের পাশাপাশি সংগীতায়োজনও করে ফেলেন। গানটি রেকর্ড করতেও সময় নেননি বেশি। মাত্র ২৫ মিনিটেই সেরেছিলেন কাজ। সুজেয় শ্যামের কথায়, 'সেটুকু সময়ের মধ্যে এক মাইক্রোফোনে ২৫ শিল্পীকে নিয়ে গানটি রেকর্ড করেছি। কাদেরী কিবরিয়া, রথীন্দ্রনাথ রায়, প্রবাল চৌধুরী, বুলবুল মহলানবীশ, মালা খুররমসহ এই কোরাস গানের প্রত্যেক শিল্পী সেদিন মন-প্রাণ উজাড় করে গেয়েছেন। হয়তো সে কারণে গানটি হয়ে উঠেছিল সম্মুখ সমরে থাকা প্রত্যেক মুক্তিযোদ্ধার অনুপ্রেরণা।'

এভাবেই রণাঙ্গনের যোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠযোদ্ধার। ফলে গান ও মেশিন গান মিলেমিশে গড়ে উঠেছিল এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ। আজও গানগুলো দেশের সংকটে সাহস যোগাতে উঠে আসে জনতার কণ্ঠে।